পল্লি-বাঙলার বাণীর দুলাল ঃ জসীমউদ্দিন

শেখ আজিবুল হক

জীবনানন্দ দাশ বলেছেন সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। অন্য ভাষায় বলা হয় poets are born -অর্থাৎ কবিরা কবি হয়েই জন্মান, একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য poets are made not born অর্থাৎ স্বভাব কবিত্ব নিয়ে কবিরা জন্ম গ্রহণ করেন একথা যেমন সত্য, তেমনি পারিপার্শ্বিক বাত াবরণ প্রকৃতির ধ্যান-তন্ময় রূপ-লাবন্যের সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছোঁয়াও কবির কাব্য কাননকে মঞ্জরিত করে তোলে। পল্লী বাংলার বাণীর দুলাল কবি জসীম উদ্দিন তাহলে কোন শ্রেণীর কবি।

প্রকৃতির পূজারী কবি জসীমউদ্দিনের কাব্য প্রতিভার উৎস নির্ণয়ে সর্ব প্রথম মনে আসে রবীন্দ্র মধ্যাহ্ন কালে এবং নজলের সমকালে জসীমউদ্দিন আবির্ভুত হলেন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায়। রবীন্দ্র-স্নেহ-সান্নিধ্যে এসে ঠাকুর বাড়ির সোনার আঙিনায় পদচারণা করা সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেননি। দু-দুটো আকাশচু ম্বী প্রতিভাকে এড়িয়ে আপনার পথ তৈরি করে এই এগিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব হল?

এর কারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কবিত্ব শক্তি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। পিতা আনসার উদ্দিন আহমদ ছিলেন একাধারে শিক্ষক এবং কবি। সা হিত্যের পোষকতা তিনি তাই পিতৃসুত্রেই পেয়েছিলেন, যেমন পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এছাড়া বাল্যকালে কবি জসীম উদ্দিন নজলের ন্যায় লোককবিদের দলে কবিগানও করেছিলেন বলে জানা যায়। বস্তুত বার্ণস, গার্থিকা, হাইনে, ম্যাকডিয়ার, তিখনোভ, প্রমুখ বিশ্বের খ্যাতনামা লোককবিদের ন্যায় তাঁর সাহিত্য-ঐতিহ্যকেও বাংলার লোকায়ত শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে লোক সাহিত্যের একটি মিষ্টতম শিষ্টরূপ দান করেছেন কবি। পল্লিগ্রাম নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন কণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক , বন্দে আলি মিয়া এবং গোলাম মোস্তাফা। এঁদের মধ্যে একমাত্র কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ই পল্লির রূপচিত্র অঙ্কনে লালিত্যময়তার পরিচয় দিলেও সমগ্র গ্রামীণ সমাজের অন্তরাত্মার সার্থক রূপায়ন ঘটেছে কবি জসীমউদ্দিনের কবিতায়। এ প্রসঙ্গে লেখক পরিমল চক্রবর্তীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়— "পল্লি কবিতায় কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব ধর্ম লালিত আর জসীমউদ্দিনের কবিতায় পল্লি জীবন কণ-মাধুর্যে মন্ডিত, কুমুদরঞ্জন পল্লি নিসর্গের প্রেক্ষাপটে ধর্ম-জীবনের কবি, কিন্তু জসীমউদ্দিনের লোক-জীবনের। কুমুদরঞ্জনের শব্দ-ব্যবহার এবং ভাষা-রীতি সহজিয়া ও আটপৌরে, জসীমউদ্দিনের লৌকিক ও গণমুখী। এবং সেই শেষোক্ত কারণেই 'পল্লীকবি'র অভিধাও জসীমউদ্দিনের প্রাপ্য, কুমুদরঞ্জনের নয়।"

পল্লিকবি জসীম উদ্দিন শুধু লোক কবি নয় লোক-লোচনে তিনি জনগণের অন্তরাত্মাকেও ধরতে পেরেছিলেন বলে হতে পেরেছিলেন মাটির কাছাকাছি জনের তথা জনগণের কবি। যেমনটি হতে পেরেছিলেন নজল এবং সুকান্তও। কবি কালিদাস রায় তাই বলেছেন, "কুমুদরঞ্জন -pastoral song রচনা করেছেন, জসীমউদ্দিন pastoral poem রচনা করেছেন রাখালিয়া সুরে যা বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ। তিনি আরও বলেন — "যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লী প্রকৃতিকে দেখিয়েছেন হিন্দুর চোখে, শ্রীমান জসীমউদ্দিন তাহাকে বাঙালীর চোখে দেখিয়েছেন।" তিনি যে বাঙলার ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা priest of nature ছিলেন তা তাঁর কাব্য-নির্মাণের ভাষা ও চিত্রকল্প থেকেই সহজে অনুমিত হয়—

ওই যে পুবে মাঠের পরে সবুজ-ঘেরা গাঁ
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা। (রাখাল ছেলে)

কিংবা

সেই ছেলেবেলা স্বপ্নের মত কত স্নেহ-ভরা মুখ
এনে দাও শুধু বারেক দেখিয়া ভরে লই সারা বুক। (পুরান পুকুর)

অথবা

খেলনাগুলি ধুলায় পড়ে হাত ভাঙা কার পা ভাঙা কার
ঝুম্‌ঝুমিটি বেহাত হয়ে বাজছে হাতে যাহার তাহার! (পলাতকা)

কখনও বা

এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরই বুকে যাবে ঝরে। (নক্সী কাঁথার মাঠ)

কখনও বা অশ্রু-মুক্তা হয়ে ওঠে প্রতিটি বর্ণমালা —

আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে? (কবর)

মনে পড়িয়ে দেয় টমাস গ্রের বেদনা কণ এলিজি-র কথা। স্মরণ করিয়ে দেয় শেলির বিখ্যাত উক্তি Our sweetest songs are those that tell of saddest thought -এর কথা মানুষের দুঃখে, মানুষের বেদনায়, মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতায় যে অন্তর নিরন্তর কেঁদেছে তাঁকে ভুলবার পথ থাকে না। মানুষের স্মৃতি-মন্দিরে তাঁর কাব্য-কৃতি অক্ষয় হয় সারস্বত কালের কপোলে। বস্তুত কবি জসীমউদ্দিনের কবিতায় কবির অন্তরাত্মাও সামিল হতে পেরেছে বলে প্রেম আর প্রকৃতি মানুষের আনন্দ আর বেদনানুভূতি শিল্প-সুন্দর বাণী-মূর্তি নিয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। আর এই কারণেই গ্রাম ও শহর, শিক্ষিত ও

অশিক্ষিত, বেদে জেলে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তাঁর সাহিত্য সকল মানুষের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। সকলের চোখের জল এসে তাঁর সাহিত্যে মিশেছে বলেই তো চিরন্তন কালের সাহিত্য-স্বীকৃতি পেয়েছে। অনুদিত হয়েছে দেশ-বিদেশের পরিভাষায়।

বুক ভরা মধু বঙ্গ-জননীর ললিত স্নেহে লালিত পল্লি-প্রাণ কবি জসীমউদ্দিন যেমন লোকায়ত সাহিত্যের কবি তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অধীনে মাসিক সত্তর টাকা বৃত্তিতে কাজ করতে এসে লোক-গাথা, লোক-গীতি প্রভৃতি সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি বাঙলার চিরন্তন প্রাণ-স ম্পদের সন্ধান পা যা তাঁকে পরবর্তী ক্ষেত্রে মাটি-মাখা মায়ের রাখালিয়া সুরের খাঁটি বাঙালি কবির স্বতন্ত্র শিরোপা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁকে এ কারণে অভিনন্দন জানিয়েছেন — "জসীমুদ্দিনের কবিতার ভাব-ভাষা ও রস-গ্রহণ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।"

কবির জন্মস্থান ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামের (মাতুলালয়) খাল-বিল-নদী, মাঠ-ঘাট, শ্যামলিমা প্রান্তর, সর্ষে ফুলের সোনা রং, প্রজাপতির সাত-রঙা পাখা, পা খির কলতান যেমন কবি মনকে আবিষ্ট করেছিল তেমনি বেদে-বেদেনীর বাঁশির সুর, সাজু ও রূপাইয়ের বিয়োগ-বিধুর কণ গাঁথা, পল্লিবধুর ডাগর আঁখি, কোনও কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। কবি মুসাফির সব কিছুর সৌন্দর্য নিয়েই তিলে তিলে তিলোত্তমা করে প্রেমের তাজমহল রচনা করেছেন কাব্যে। যেদিকে মানুষের দৃষ্টি সচরাচর পড়ে না, সভ্যতা গড়ার যে কারিগর বা ঘরামির কথা কেউ ভাবে না, সমাজে পড়ে থাকা অবহেলিত অন্ত্যজ, মূর্খ, নীরব সেই পর্ণকুটিরবাসী মানুষের হৃ দয়ে আবহমান কাল ধরে যে কাব্য-কবিতা, গান-ছন্দ-সুর-প্রেম, আনন্দ-বেদনা লুকিয়ে আছে কবি জসীমউদ্দিন সেদিকেই আকর্ষণ করলেন আমাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি তাঁর লোকায়ত শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৩), 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'বালুচর' (১৯৩০) 'রঙিলা নায়ের মাঝি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্য ও গানের মধ্যে অন্যতম। তন্মধ্যে 'নক্সী কাঁথার মাঠ'কে কাব্যোপন্যাস যেমন বলা যায় তেমনি বেদনার মহাকাব্যও বলা যায়। মিসেস মিলফোর্ড The field of the embroidered quilt নামে বইটির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেন।

নজলের 'বিদ্রোহী'র ন্যায় যে কবিতা নিয়ে কবি জসীমউদ্দিন রাতারাতি কবি খ্যাতি অর্জন করেন তা হচ্ছে 'কবর'। তখন সবে মাত্র বিয়ে ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছেন। বে ানের বাড়ি যাবার পথে ফরিদপুরের রাজবাড়ি স্টেশানে বেদে বেদেনীর গান শুনে যেমন অভিভূত হন, তেমনি বোনের বাড়ি গিয়ে কলেরায় লোক মরেছে দেখে বেদনা-বিধুর চিত্তে লেখেন 'কবর' শীর্ষক অনবদ্য শোকগাথার কবিতা, যা বাঙলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ হয়ে উঠেছে

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাত দিন
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীন।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি
দাদু ধরো ধরো বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে।

মৃত্যু-দর্শনের এই কণ-কোমল দৃষ্টির জন্যই তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই এটি ম্যাট্রিক পরীক্ষা স্তরে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হবার দুলর্ভ সৌভাগ্য অর্জন করে যা বাঙলার আর কোনও কবির ভাগ্যে জোটেনি। আর ঘটেছিল তাঁর শিক্ষক, কবি-সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্যেই। অধ্যাপক সেন তাঁর forward পত্রিকায় ছাত্র-কবির যে পরিচিতি তুলে ধরেন তাতে আন্তজার্তিক কবিখ্যাতি অতি সহজেই জুটে যায়। কবি নজলকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যেমন মোহিতলাল মজুমদার, তেমনি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মুক্ত ও মুগ্ধ কণ্ঠে গাইলেন জসীম বন্দনা— "আমি গৌরবান্বিত যে, আমি ময়মনসিংহ গীতিকার মত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার করে পৃথিবীর রস-পিপাসুদের সামনে তুলে ধরেছি। আমি গৌরবান্বিত যে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র ন্যায় পুস্তক রচনা করেছি। কিন্তু সব চাইতে আমার গৌরব যে আমি কবি জসীমুদ্দিনের শিক্ষক হতে পেরেছি। তাঁর কবিতা আমার কাছে শেলী, কীটস, বায়রণ এমন কি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার চেয়ে ভালো ল াগে। কারণ তাঁর কবিতায় আমি আমার বহুকাল ছেড়ে আসা আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা পল্লী মায়ের শীতল স্পর্শ পাই। যে মায়ের চেয়ে আপন বলতে আমি অ ার কাউকে জানিনে। তার পদ্ম-শালুক ফোটা খাল-বিল, ভাটিয়ালী গানে মুখর পদ্মা-যমুনা নদী, অতসী অপরাজিতা, টগর চামেলী ফুলের সুগন্ধভরা আঙিনার কে াল, মায়ের এই অপরূপ মূর্তি আমি পাই জসীমের কবিতায়।" আরও হৃদয়াবেগে অধীর হয়ে বলেছেন "আমি হিন্দু, আমার নিকট বেদ পবিত্র, গীতা পবিত্র, কিন্তু 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', পুস্তক তাহার চাইতেও পবিত্র। কারণ ইহাতে আমার বাংলা দেশের মাটির মানুষ গুলির কথা আছে। আমার গ্রামগুলির বর্ণনা আছে।"

সৈয়দ আলী আহসান এর মতে — "আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব প্রকাশ ও আঙ্গিকে যাঁরা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি জসীমউদ্দিন। তিনি শুধু গ্রামীন কবি ছিলেন না। কাহিনী-কাব্য-ছন্দ ও গীতিময়তায় তিনি বাংলা কাব্যে নয়া দিগন্তের উন্মোচন করেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক কবিতার কথা চিন্তা করা যায় না।" কবি জসীমউদ্দিনের কাব্য রীতি সম্পর্কে সীমানা জরিপ করতে গিয়ে সমালোচক আবুবকর সিদ্দিক বলেছেন— "আধুনিক জীবনের যে জটিল দ্বন্দ্ব মানসিকতা তার ধার কাছ দিয়েও তিনি যান না।... কিছুটা কথকের, কিছুটা চারণের ভঙ্গিমা তাঁর।"

তবু এই সহজ সরল পল্লি-গীতিকা বা গাথা কাব্য কিংবা ode ধর্মীয় লিরিক কবিতা অন্যমতে "এমন সহজিয়া এমন মরমিয়া রাখালি বাঁশির সুর, আনমনা করা নষ্টালজিয়া নির্ভর ভরদুপুরে বা অস্তগামী সূর্যের লাল রং, দীঘির কালো জলে কাঁপা কাঁপা, কোকিল-ডাকা সন্ধের ছবি কোন্ বাঙালি পাঠক ভুলতে পেরেছেন?" (প্রনব চট্টোপাধ্যায়)।

পল্লি-প্রাণ কবি জসীমউদ্দিন যেমন পল্লি প্রকৃতি আর গ্রাম-বাঙলার মানুষ ও গ্রামীন শাশ্বত সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন, গ্রামীন লোকায়ত সুরটিকে নিজের বীনায় বাঁধতে পেরেছিলেন, তেমনি গ্রাম্য অন্ত্যজ অস্বীকৃত অশিক্ষিত মানুষের জীবনের দুঃখ সুখ, মিলন-বিরহ-ব্যথা-বেদনার বৈচিত্র্যের কথাও অত্যন্ত দরদ ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমের দ্বন্দ্ব, আর্তি, শোক, দুঃখ ইত্যাদির বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে নজল প্রেম-গীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নজলের মতো তিনিও বিদ্রো হ ও আত্মনিবেদন করেছেন। নজলের মতো তিনিও গানে লোক-প্রিয়তা অর্জন করেন। যেমন—

ভাবিয়াছ মোরা গাঁয়ের রাখাল নাই কোন হাতিয়ার
যে লাঙল পারে মাটিকে ফাড়িতে ভাঙিতেও পারে ঘাড়।
(রঙিলা নায়ের মাঝি)

সুকান্ত, শেলী ও নজলের ফরিয়াদী কবিতার মতো জসীমউদ্দিনের কবিতাও স্মরণীয়—

সব দুনিয়ার আহার জোগাই/ সেই না ফসল হইতে
(আর) আমরা কেন খাইতে না পাই/পারোকি কেউ কইতে? (পদ্মাপারে)
'আমার খোদারে দেখিয়াছি আমি গরীবের কুঁড়ে ঘরে' কিংবা 'একটু খানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে', কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় নজলের 'নুন নাই ঘরে উনুন জ্বলে না চালে ঘূণ ধরা বাতা'। প্রেমের চিত্র অঙ্কনেও কবি কত নিপুন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'হাসু' কাব্যে----
চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো মাখিয়ে দেব সুখে
তারা ফুলের মালা গাঁথি জড়িয়ে দেব বুকে।
এ যেন 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী' গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া প্রেমের বর্ণনায় ----
আমি কি তোমার কবি হব রানী তুমি কি কবিতা হবে
তুমি কি আমার মনের বনের বাঁশীটি হইয়া রবে!
এতে সজল হৃদয়ের গজল আর্তি অনুরণিত। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা অকৃত্রিম দরদ ও অনন্ত সহানুভুতিনিয়েই কবি মানুষের মর্যাদাবোধও ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন অকুণ্ঠ ভাষায়---
এদেশ কাহারো হবে না একার/যতখানি ভালবাসা
যতখানি ত্যাগ যে দেবে পাবে ততখানি বাসা।' (বাস্তু ত্যাগী)
ভয়াবহ সেই স্বাধীনতার দিন গুলিতে 'গীতারা কোথায় গেল' ছোট্ট গীতামণিদের জন্য কবির এই যে আক্ষেপ, এই যে বেদনাবোধ, এই যে অন্তর্বেদনা এ জন্যই কবি বেঁচে থাকবেন বাঙালির মনে ও প্রাণে, বাণী ও সুরের অঙ্গনে চিরকাল।
রবীন্দ্র নজল জীবনানন্দ সুকান্তের মতো কবি জসীমউদ্দিনও সমকালীন কবিদের দিগন্তব্যাপী অণ-কিরণজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজস্ব কাব্যবোধ, স্বতন্ত্র ভাষা, মানুষের প্রতি মমত্ব নিয়ে প্রকৃতির ধেয়ানী দুলাল হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বলেই তিনি বাঙলার সারস্বত মন্ডপে শাশ্বত আসন পেয়েছেন। সমালোচক তাই সঙ্গত উক্তিই করেছেন -- "বিশ শতকের সময়সীমায় জন্ম ও জীবনাবসানের মধ্যে বিশশতকের দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক হাজারো রকমের ভয়ংকর প্রতিকুল অবস্থার প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও একেবারে সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে গ্রামীন পল্লী প্রকৃতি ও পল্লী সমাজের মানুষের বিরহ-মিলন, রূপ-অরূপ ও সুন্দর-অসুন্দরের পালাকার কবি জসীমউদ্দিন নিজে একক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা কবিতায় বিরাজ করবেন।"

প্রসঙ্গ সূত্র ঃ
১। সুচয়নী --- জসীমউদ্দিন
২। বঙ্গ-বসুন্ধরা (জসীমউদ্দিন সংখ্যা -- ১৯৯৬)
৩। নক্সী কাথাঁর মাঠ --- জসীমউদ্দিন

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com